Vol. 24 | No. 1 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গারো উপজাতি ও তাদের সংস্কৃতি

Volume	24
Issue	1
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আলি নওয়াজ
Published online	December 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v24i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v24i1.5
Pages	60-68
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গারো উপজাতি ও তাদের সংস্কৃতি

আলি নওয়াজ

গারোরা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান না হলেও এ দেশের আদিবাসী। তাদের সমাজ-ব্যবস্থা আজও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বলয়ে আদিম প্রথানুশাসনে পরিচালিত এবং দেশের আনুষ্ঠানিক আম আইন-কানুন তাদের উপর সর্বত্র সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়। গারোদের আদিম যাযাবর-চরিত্র তাদের মাঝে কিছু কিছু আজও লক্ষণীয়। অতি সহজেই ভিটে-মাটি ছেড়ে নির্ঝনঝাট কোনো পছন্দনীয় স্থানে চলে যেতে এরা দ্বিধা করে না। বাংলাদেশ হতে, বিভিন্ন সময়ে বহু গারো বাস্তু-ভিটা ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। এ-প্রক্রিয়াটি তাদের মধ্যে অনেক পূর্ব থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত লক্ষণীয়। বাংলাদেশে বন-জংগল হ্রাস পেতে থাকলে গারোদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। গারোরা সাধারণতঃ পাহাড়-পর্বতের গায়ে ও জংগলাকীর্ণ স্থানে বসবাস করতে অভ্যস্ত। এ জন্যেই, এদেরকে মধুপুর ও ভালুকা জংগলে এবং গারো পাহাড়ের পাদ-দেশে বসবাস করতে আজও দেখা যায়। এককালে,—ভাওয়াল মধুপুর গড় থেকে সুরু করে (ভালুকাসহ) গারো পাহাড় পর্যন্ত এ-বিস্তীর্ণ অঞ্চল জংগলাকীর্ণ ছিলো। ময়মন-সিংহ সহর হতে গারো পাহাড়ের দিকে এগুলে সে জংগলের রেশ আজও চোখে পড়ে। এ অঞ্চলটি প্রাচীন কালে কেমন ছিলো, ময়মনসিংহ গীতিকার নিম্ন লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে কতকটা আঁচ করা যায় :

গারুয়া পাহাড় হইতে দক্ষিণ সাগর।
ঘর বাড়ী নাই কেবল নল খাগড়ার গড়॥

পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এ-বিস্তীর্ণ বন্য অঞ্চলটি কোনো কালে উপজাতি অধ্যুষিত ছিলো। উত্তরে—দক্ষিণে এ অঞ্চলটি আরও ব্যাপক। গারো পাহাড় হতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত এই বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে মোংগল গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন উপজাতিসমূহ এককালে একচেটিয়া বসতি করতো। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে গারোদের বসতি সম্পর্কে দ্বিমত আছে। মতান্তরে, ইংরেজ আমলে উপনিবেশিক সরকার স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে খানিকটা ভারসাম্য রক্ষার রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক গারো সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে দেয়।

যাহোক, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল যে এককালে উপজাতি-অধ্যুষিত ছিলো, তার সাক্ষ্য বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতিতে মিলে। আমাদের লোক-সংস্কৃতির বহু উপাদান মূলতঃ আদিম ও উপজাতীয়। অবশ্য সব দেশেই লোক-সংস্কৃতিতে আদিম সংস্কৃতির ছাপ কম বেশী বিদ্যমান। আজও পূর্ব-ময়মনসিংহের উত্তরাংশে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও কক্সবাজারের পাহাড়াঞ্চলে বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় লোকদের বসতি দেখতে পাওয়া যায়। তারা প্রায় সবাই মোংগল গোষ্ঠীভুক্ত। মোংগলদের যে আবয়বিক বর্ণনা, তা সবই এদের মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ে গারোরা নিঃসন্দেহে মোংগল গোষ্ঠীভুক্ত। অবশ্যি, গারোদের মাঝে সম্প্রতিকালে দু'একটি মুখ দেখা যায়, যাদের গায়ের রং, নাক-মুখের গঠন, কপাল-কপোল ও চোখ খাঁটি মোংগলদের থেকে খানিকটা দূরে সরে

গিয়েছে। এ সম্প্রতিকালের যখন থেকে এদের উপর বহিঃসভ্যতার বাতাস আস্তে আস্তে লাগতে থাকে। পূর্বে এরা নিজেদের সাংস্কৃতিক এলাকাতেই অবিমিশ্রিতভাবে বসবাস করতো বলে তাদের মধ্যে কৌলিক কোন ভেজাল মাথা গলাতে পারেনি। পক্ষান্তরে, পূর্ব ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বহু মুখ হাটে-বাজারে দেখা যায়, যাদেরকে গারোদের সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে দেয়া যেতে পারে। সম্ভবতঃ এদের পূর্ব পুরুষ কোনোকালে গারোই ছিলো। কালক্রমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে ওরা ছিটকে পড়ে যায় কিন্তু কৌলিক কারণে তাদের মোংগল বৈশিষ্ট্য মাঝে-মধ্যে ঘুরে ফিরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ভালুকাতে এককালে প্রচুর সংখ্যক গারো বসবাস করতো। গত কয়েক বছরের মধ্যে ভালুকার বন-এলাকা প্রায় আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে, গারোদের সংখ্যাও এখানে হ্রাস পেয়েছে। তারা নতুন কোনো আরণ্য আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। জয়দেবপুর বন-এলাকাতেও একই কারণে অতি নগণ্য সংখ্যক গারোই আজকাল দৃষ্ট হয়। তবে, মধুপুর জংগলে আজও প্রচুর গারো-বসতি আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মধুপুর জংগল পূর্বের মতো আজ আর অতো গহীন নয়। এককালে, এ জংগল এতো গভীর ছিলো যে, সেখানে বাহিরের লোকদের প্রবেশ করার দুঃসাহস হতো না। ইংরেজ আমলে মধুপুর অরণ্যে সন্ত্রাসবাদীরা গোরা ফৌজদের আক্রমণ হতে নির্বিঘ্নে পালিয়ে থাকতো। বাঘ-ভালুক, বিষাল সাপ, বিশাল অজগর ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণকে পরোয়া না করে সেখানেই গারোরা নির্ভয়ে বাস করতো। বাঘ-ভালুকের চেয়ে ইতর জনকে সম্ভবতঃ এরা বেশী ভয় করতো। মধুপুর জংগল পূর্বের মতো এতো নিবিড় না হলেও, তা আজও ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বৃহৎ অরণ্যই বটে। আজও সেখানে, অজগর আস্ত মানুষ গিলে ফেলে, এমন ঘটনা ঘটে। গারোদের এলাকাটি মুক্তাগাছার কিছু পর থেকে শুরু করে প্রায় টাংগাইল সহরের নিকটবর্তী উত্তর-দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত জংগলের বুক চিরে ময়মনসিংহ-টাংগাইল—ঢাকা রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের জন্যে আজকাল অত্যন্ত ব্যস্ত ও সশব্দ হয়ে পড়েছে। তাই শান্ত ও নিরীহ গারোরা রাস্তার নিকট থেকে আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু মাঝে মধ্যে ওদেরকে রাস্তার আশে-পাশে কাঠ খড়ি কুড়াতে ও সড়ক নির্মাণের কাজ করতে দেখা যায়। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে গারোরা জংগলের বাহিরে আসতে অত্যন্ত সংকোচবোধ করতো। কোনো গারো জংগলের বাইরে এসে কখনও অ-গারো লোকদের দৃষ্টিতে পড়লে, তৎক্ষণাৎ আবার জংগলে ঢুকে পড়তো। কিন্তু আজকাল আর তা নয়। আজকাল গারো মেয়েদের দেখা যায়, উদোম গায়ে জংগল হতে কুড়ানো জ্বালানীকাঠ, বন্য ফল-ফলারী নিকটস্থ বাজারে নিয়ে বিক্রী করছে। কয়েক দশক পূর্বে তাদের নিজেদের এলাকায় তাদের নিজস্ব হাট ছিলো। পন্য—বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ওরা বেচা-কেনা করতো—পয়সা কড়ির ধার ধারতো না। তাদের অর্থনীতি তাদের নিজেদের মধ্যে সীমিত ছিলো। এমন কি, নিজেদের এক প্রকার ক্ষুদ্র তাঁতে, জুমে উৎপন্ন কার্পাস দিয়ে এক প্রকার সংকীর্ণ 'ডোমা' কাপড় তৈরী করে তা দিয়েই কোনোরূপে কটিদেশ আবৃত করতো। গারোরা এ পোষাক আজও ছাড়েনি। এদের নেংটি পরতেও দেখা যায়। এমন কি অনুষ্ঠানাদিতেও এরা নেংটি পরে আসতে বিব্রত বোধ করে না। অবশ্য, কতিপয় অবস্থাপন্ন গারো চমৎকার লেবাসে সুসজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

গারোদের সাপ্তাহিক হাটে বাইরের লোকেরাও সস্তায় জিনিষ পত্র কেনার আকর্ষণে যেতো। গারো পাহাড়ের পাদদেশে জংগলাকীর্ণ স্থানে আজও নাকি গারোদের নিজস্ব হাট আছে। বেং ও কুচে মাছের শুটকি ও অন্যান্য শুটকিই নাকি ও-সব হাটের প্রধান পণ্য দ্রব্য। গারোরা কুচে মাছ খুবই পছন্দ করে। কুচে মাছ ধরার জন্যে কখন-

কখনও গারোদের দল বেঁধে অবাধে খাল বিলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ঠিকাদাররা আজকাল কখনো কখনো রাস্তা তৈরী, মাটি-কাটা ইত্যাদি কাজ করার জন্যে গারো নারী-পুরুষকে দলে দলে নিয়ে আসে। গারোরা বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং এদের পারিশ্রমিকের দাবীও সম্ভবতঃ কম। এক সময়ে, এদেরকে শুধু শুটকি মাছ দিয়ে একবেলা খাওয়ালেই সারা দিন কাজ করানো যেতো। ধান রোপনের কাজে গারো যুবতীরা ওস্তাদ। আজকাল শুধু খাবার দিলেই গারোদেরকে বিনে পয়সায় কাজে নিযুক্ত করা যায় না। কারণ এখন, তাদেরকে শ্রমিক-ঠিকাদাররা নানা জায়গায় নানা কাজে নিয়ে যায়। অবশ্যি ঠিকাদাররা, নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত কমই এদেরকে দেয়।

পাহাড়-জংগলের সঙ্গে গারোদের আত্মিক সম্পর্ক থাকার কারণ, আদিকাল থেকেই এদের আসল পেশা ছিলো জুম চাষ ও শিকার। এ বৈশিষ্ট্য এদের আজও মুছে যায়নি। জংগলাকীর্ণ পর্বতগাত্রে আগুন লাগিয়ে জংগল পরিষ্কার করে ওখানে মৌসুমে মৌসুমে ওরা ধান থেকে সুরু করে ফল-ফলারী, তরিতরকারী ইত্যাদির বীজ এক সাথে সুঁচালু কাঠির সাহায্যে একটু মাটি খুঁড়েই পুঁতে দেয়। এই চোখা কাঠিটি, জংগল কাটার জন্যে একটি বিশেষ ধরনের মাথাভারি বেঁটে দা, ফসল তোলার জন্যে বাঁশ-বেতের তৈরী এক ধরনের ঝাঁপি—এই তাদের কৃষি-যন্ত্রপাতি। গরু, লাংগল, জোয়াল ইত্যাদি দিয়ে কৃষি কাজ করা গারোদের ঐতিহ্যগত নয়। আজকাল অবশ্য, এ ধরনের চাষবাস ও গারোরা কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে। গরু-গাই লালন-পালনের ঐতিহ্য তাদের প্রাচীন কিন্তু তা কৃষির উদ্দেশ্যে নয়, মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যেই। পশু পালন এদের একটি পেশা। শুকর, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি ওরা প্রচুর পরিমাণে পালন করে। কারণ, মাংস এদের উৎসবাদিতে ও অতিথি সৎকারে অপরিহার্য জিনিস। উৎসবের সময় আত্মীয়ের বাড়ীতে ওয়াক (শুকর), হাঁস-মোরগ ইত্যাদি নিয়ে গারোদেরকে যেতে হয়। অবশ্যি, অর্থনৈতিক কারণে দিন দিন এ সব প্রথা হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু আজও চালু আছে।

জুম চাষ, শিকার ও পশু পালন এদের মূল পেশা বলেই পাহাড়-জংগলে বসবাস এদের প্রয়োজন। জুমচাষের জন্যে পাহাড়ের ঢালু গাত্রই আবশ্যক। এ জন্যে গারো পাহাড়ের পাদদেশে সর্বোচচ সংখ্যক গারো-বসতি দেখা যায়। গারো পাহাড়ের অধিকাংশ মেঘালয়ে পড়েছে বলে ওদিকে গারো-বসতি আনুপাতিকভাবে বেশী। মধুপুর ও ভালুকা জংগলাকীর্ণ অঞ্চল এবং প্রায় সবটা অঞ্চলই ঢেউ খেলানো ছোট ছোট পাহাড় তথা টিলার সমষ্টি। এ কারণেই, এ দুটো অঞ্চল এদের বাসোপযোগী। আজকাল মানুষ ভালুকার জংগল ও টিলা কেটে প্রায় সাফ ও সমতল করে ফেলেছে। গারো পাহাড়ের পাদদেশে কিংবা নিকট এলাকায় যে-সব কিংবা মেঘালয়ের জংগলাকীর্ণ স্থান ছিলো, সে গুলোর অবস্থা দিন দিন প্রায় তথৈবচ হচ্ছে। ফলে, বনবাসে অভ্যস্ত গারোরা সে সব অঞ্চল ছেড়ে অপেক্ষাকৃত জংগলাকীর্ণ স্থানে কিংবা মেঘালয়ে জংগলাকীর্ণ 'তুরা' অঞ্চলে আশ্রয় নিচ্ছে। পক্ষান্তরে এলাকাগুলো বনহীন হয়ে যাওয়ার জন্যে অন্যান্য বাঙালীরা ওখানে ঘরদোর বেঁধে বসবাস সুরু করে দিয়েছে। ওসব অঞ্চলে যে সব গারো আজও বসবাস করছে, তারা চতুর নতুন প্রতিবেশীদের সংগে স্বভাবতই খাপ খাওয়াতে পারছে না।

মধুপুর জংগল বিরাট ও ব্যাপক বলে তা এতো সহজে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। তাই, এখানে প্রচুর সংখ্যক গারো আজও আছে। তবে, ঐ সব এলাকায়ও কিছু কিছু অ-গারো জনগণ ঢুকে পড়েছে। কালে, হয়ত এখান থেকেও এদের চলে যেতে হবে অথবা এমন দিন আসতে পারে, যখন গারোরা গোটা জনপদের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। তা গারোদের জন্যে মংগলজনক হতে পারে; কিন্তু তা' হবে একটি নৃতাত্ত্বিক মূল্যবান সূত্রের অবলপ্তি।

খৃষ্ট ধর্মের পাপ ও নরকের ভয় সত্ত্বেও আজও গারোরা নিজেদের আদিম সংস্কৃতিই অবচেতন ভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। গারোদের মতো, পূর্ব ময়মনসিংহের উত্তরাংশের সীমান্ত অঞ্চলে 'হাজং' নামে আর একটি মোংগল গোষ্ঠীভূত উপজাতি বসবাস করে। এরা আজকাল নিজেদেরকে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী বলে থাকে কিন্তু মূল সংস্কৃতিতে ওরা তাদের আদিম বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করে চলছে। শতাব্দী শতাব্দীর প্রয়াসে খৃষ্টান মিশনারীর ও ইংরেজ অফিসারেরা গারোদের মাঝে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে সমর্থ হয়েছে। তাদের প্রয়াস বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো। প্রাথমিক পর্যায়ে ভালো খাবার দাবার চোখ ঝলসানো পোষাক পরিচ্ছদ, মূল্যবান উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে দু'একটি গরীব পরিবারের রাখাল গারো বালককে গোপনে গোপনে মিশনারীর লোকেরা কিছু লেখা-পড়া শিক্ষা দিতে পেরেছিলো। এ সংকীর্ণ সূত্র ধরেই পরবর্তী পর্যায়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার সুরু হয়। মিশনারীদের শতাব্দীর অনলস প্রয়াসে আজ বাংলাদেশের সমতল ভূমির বারো আনা গারোই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তাদের বদৌলতে কিছু কিছু গারো-নারী-পুরুষ কিছু শিক্ষাও গ্রহণ করেছে, এমন কি উচ্চ শিক্ষাও। অবশ্য, মাতৃতান্ত্রিক গারো পরিবারে ছেলের চেয়ে মেয়ের গুরুত্ব ও আদর বেশী হওয়ার জন্যে গারো সমাজে নারী শিক্ষার হার পুরুষের চেয়ে বেশী। কঠোর পরিশ্রমী শিক্ষিতা গারো বালিকারা আজকাল কেউ কেউ বাংলাদেশে ও বাহিরে হাসপাতালে অত্যন্ত সফলতা, তৎপরতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেবিকার চাকুরী করছেন। কিছু কিছু অন্য চাকুরেও আজকাল গারোদের মধ্যে পাওয়া যায়। এদের পোশাক-আসাক আধুনিক, আর্থিক অবস্থাও ভালো হয়েছে। কিন্তু এর প্রভাব গোটা গারোসমাজ ও সংস্কৃতিতে খুব একটা পড়ছে না। স্থূলভাবে বলা যায়, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে, এমন কি, বৈবাহিক ব্যাপারেও খৃষ্টধর্মের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে ওরা ওদের সনাতন সংস্কৃতিই মেনে চলে। এতেও সুপরিকল্পিত পরিবর্তন আনার জন্য কতিপয় শিক্ষিত খৃষ্টান গারো আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিছু কিছু হয়ত সফলও হয়েছেন। হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর, বিড়িশিরি এলাকায় গারোরা খৃষ্টান মিশনারীদের বদৌলতে শিক্ষা, আধুনিক জীবন ও আর্থিক সচ্ছলতা পেলেও, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, খৃষ্টানধর্ম তাদের নিজস্ব আদিম ও অকৃত্রিম সাংস্কৃতিক সত্তাকে আবর্তিত করেছে। এবং এভাবে এককালে তা অবলুপ্তও হবে। পূর্বে গারোদের মধ্যে যেরূপ একতা ছিলো, এখন নাকি তা আর নেই। এ জন্যে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো শিক্ষিত খৃষ্টান গারো মিশনারীদের সম্পর্কে তীর্যক উক্তি করে থাকেন। নিরীহ গারো মেয়েদের আদিম সরলতার সুযোগ নিয়ে মিশনারীদের কোনো কোনে বিদেশী চতুর কর্তা আপত্তিকর আচরণ করেছেন, এমন কথাও কারও কারও মুখে শুনতে পাওয়া যায়। একজন মিশনারী ডাক্তার একটি সুঠাম সুন্দরী গারো মেয়েকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বদেশেই পাড়ি দিয়েছেন। অবশ্যি, সাদি করে নিয়েছেন বলে শুনা গেছে। খৃষ্টান মিশনারীরা গারোদেরকে এক উন্নত জীবনের সন্ধান এবং দুর্যোগের সময় অর্থ সাহায্য দিলেও, তাদের সম্পর্কে যে এ জাতীয়উক্তি, তা গারোদের নিজস্ব সনাতন সংস্কৃতির প্রতি রক্ষণশীল প্রীতিরই পরিচায়ক।

সম্ভবতঃ গারো পুরুষের চেয়ে মহিলারাই অধিকতর রক্ষণশীল। ধর্মীয় ব্যাপারে, আচার অনুষ্ঠানে ও পোষাক-পরিচ্ছেদের দিক হতে নতনকে আলিঙ্গন করার ব্যাপারে পুরুষেরা মহিলাদের চেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে বলে মনে হয়। রক্ষণশীলতা নারীদের একটি স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আদিম যুগে নারীরাই পুরুষদেরকে সংহত ও সংযত করেছে, পরিবার, সমাজ ও কৌম গঠনে সাহায্য করেছে। গারো সমাজে আদিম বৈশিষ্ট্য-ধারা আজো প্রবহমান বলে গারো মহিলাদের রক্ষণশীল ম.নাবৃত্তি আজও তাজা রয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সহায়-সম্পদের ওপর নারীদের মালিকান্য

ইত্যাদি পুরুষ তথা পরিবারকে সংহত রাখে বলে আজো গারো মহিলাদের ধারণা। গারো পুরুষেরা সাধারণতঃ আলসে ও দায়িত্বহীন হয় বলেই এরূপ ধারণা জন্মেছে। অবশ্যি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই পুরুষদেরকে এমন করেছে। গারো সমাজের আদিম ঐতিহ্যকে নারীরা সযত্নে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুরূপ প্রস্তুতিও তাদের আছে। আমি হালুয়াঘাটের বেশ কিছু সংখ্যক গারো নারী-পুরুষের একই সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলুম। তাদের বয়স ১৬–৪০। অধিকাংশই ছিলো মহিলা এবং এদের অধিকাংশের বয়স ৩০-এর নীচে ও ২০-এর কোঠায়। এদের অধিকাংশই কমবেশ কিছু শিক্ষিতাও ছিলেন। সবাই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন তারা আদৌ কামনা করেন না। বিবাহের পর স্বামী-গৃহে বসবাস করার প্রশ্নে তারা সবাই সমভাবে জোরালো নেতিবাচক বক্তব্য রেখেছেন। সম্পত্তির মালিকানা পুরুষের হাতে আংশিকভাবে অর্পণের প্রশ্নেও তারা দৃঢ়ভাবে আপোষহীন। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, খৃষ্টের প্রেম-ধর্মে দীক্ষিত আধুনিক স্নেহশীলা ভগিনীগণ কখনও কখনও ভাইদেরকে কিছু সম্পত্তি দিয়ে থাকেন কিন্তু অস্থায়ীভাবে; প্রয়োজনে আবার তা ফেরত নিয়ে যান। তারা বলেছেন, স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে দু'চার দিন থাকতে তাদের আপত্তি নেই কিন্তু বৌ হয়ে থাকা কখনো বরদাস্ত করা যায় না। অবশ্য দু' একটি আধুনিক শিক্ষিত দম্পত্তি দেখেছি যারা স্বোপার্জিত অর্থে নব নীড় রচনা করে সুখের স্বাধীন সংসার পেতেছেন। কিন্তু মেয়েটি এ অপরাধে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হারিয়েছেন। সমাজে প্রতিষ্ঠাহীনতাই সম্ভবতঃ গারো পুরুষদের সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী করেছে। ধর্মান্তরের প্রশ্নেও তা হবে। বিবাহের পূর্বে কয়েকটি বছর মাত্র গারো ছেলেরা মাতার সংগে বসবাস করে। দীর্ঘকাল বিয়ে না হলে মাতৃ-গৃহে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে এবং ছেলেকে আদেশ-উপদেশ দিতে থাকে বিয়ে করে কোথাও চলে যাওয়ার জন্যে। প্রত্যেক পুরুষকেই ঘর-জামাই যেতে হয়। সাদা কথায়, স্ত্রীর বাড়ীতে পুরুষটি জীবন-ভর বেগার খাটে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেক সময় পুরুষেরা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হয়ে পড়ে। সম্পত্তির মালিক কন্যাগণ ইচ্ছা করলে বিপত্নীক পিতাকে ঘর থেকে জবাব দিয়ে দিতে পারে। স্ত্রীর বর্তমানে, পিতা ছেলে মেয়েদের থেকে ভালো ব্যবহারই পায়। স্ত্রীর মৃত্যু হলেই যত সব নেঠা। এ জন্যে, পিতাদের সর্বদাই কন্যাদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কারণ, মায়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিকানা বর্তে মেয়েদের উপর। বিপত্নীক লোকটিকে স্ত্রীর বংশ থেকে অপর একটি স্ত্রী সরবরাহ করা সে গোত্রের কর্তব্য। সে ক্ষেত্রে লোকটি সে বাড়ীতেই বহাল তবিয়তে থাকতে পারে। নচেৎ ওকে পুত্র-কন্যা ছেড়ে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু লোকটি যাবে কোথায়? সে তার মায়ের কিংবা বোনের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারে না। তখন সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। এ কারণে ছেলে–মেয়েদের প্রতি পিতার আকর্ষণ খুব কমই হয়।

নব বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীর বাড়ীতে প্রাথমিক পর্যায়ে খুব সংযত ও সংকুচিত হয়ে সমঝে চলে। তার বিবাহিতা স্ত্রী আদর যত্নে স্বামীটিকে নানাভাবে আগলে রাখার চেষ্টা করে। তথাপি স্বামী বেচারা নতুন পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করে। প্রথম প্রথম বিবাহিত স্বামীকে কাজের বেশী চাপ দেয়া হয় না কিন্তু পরে যে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়। স্ত্রীর সঙ্গে বয়সের কিংবা অন্য প্রকার বেমিল হলে কখনো কখনো পিতৃগৃহে, অন্যত্র, এমন কি বনে–জংগলেও লোকটি পালিয়ে যায়। পলাতক স্বামীকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে আসা হয়। এভাবে আনার সময় কখনো কখনো মারামারিও হতে পারে। কিন্তু অনেকগুলো বলবান লোক একটি যুবককে তুলে নিয়ে আসেই। এতে ছেলের পিতা, গোত্র কিংবা যে-কেউ বাঁধা দেয় না। এটাই স্বীকৃত নিয়ম। অবশ্য আপোস রফার মাধ্যমেও এ কাজ হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বিবাহের পর ছেলে সুখে থাকে কি দুঃখে থাকে, এ নিয়ে বাপ-মায়ের কিংবা ভাই-বোনদের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

পত্নীগৃহে প্রথম যাওয়ার সময় বিবাহিত যুবক রোদন করে এবং সে দৃশ্য কখনো কখনো অত্যন্ত মর্মন্তুদ হয়। কিন্তু এতে পিতা-মাতা কিংবা ভাই বোনদের মনে দুঃখ হয় না। পিতামাতা-বোন বাড়ীঘর ও গ্রাম চিরকালের মতো ছেড়ে যেতে যুবকটির আদৌ ভালো লাগে না। কিন্তু তবু যেতেই হয়। অবশ্যি, বিবাহিত যুবকটি কখনো কখনো স্ত্রী-সমভিব্যাহারে মাতৃগৃহে আগমন করে। পিতা-মাতা দুচার দিনের জন্য আদর-যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করে দেয়।

অনেক সময় কোনো বিবাহ-লায়েক কন্যার পিতা পছন্দসই কোন যুবককে একদল শক্তিশালী ব্যক্তির সাহায্যে খুসীমতো মাঠঘাট থেকে পাকড়াও করে এনে কন্যার সঙ্গে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ করে দেয়। গারো যুবকেরা বিবাহকে ভয়ের চোখে দেখে এবং বিবাহে অনীহা প্রকাশ করে বলেই এমন জবর-দস্তির প্রশ্ন ওঠে। ধৃত যুবকটিকে 'খামাল' এসে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি অমুক মেয়ের মন খাও?" "হ্যা, খাই।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই বিবাহ—কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ধৃত যুবকটি যে পর্যন্ত 'হ্যাঁ' না বলে সে পর্যন্ত রেহাই নেই। ঠেলায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ওকে কবুল করতেই হয়। অবশ্যি, ক্ষেত্র বিশেষে অতি সহজেই যুবকটির সম্মতি পাওয়া যায়, এমন কি, ধরে আনার সময়ও তেমন বাধা দেয় না। পাত্রী অজানা-অচেনা, বিধবা, পূর্ব সম্পর্কে ফুফু বা মামী, মাতৃসমা বয়স্কা কিংবা কুশ্রী হলেই যুবকের তরফ থেকে বাধা পাওয়া যায় প্রবল। এসব যুবক সাধারণতঃ ভাগ্নেদের থেকে ধরে আনা হয়। বিধবা মামী ও ভাগ্নের মধ্যে বিয়ে হতে আপত্তি নেই। তবে বড়ো একটা মিল হয় না। গারো সমাজের বৈবাহিক সূত্রানুসারে যে যে গোত্রে বিবাহ-সম্পর্ক সম্ভবপর, সে গোত্রে যদি সমবয়স্ক পাত্র না থাকে, সে ক্ষেত্রেই অসম বিবাহ হয়ে থাকে।

দাম্পত্য জীবনে যেনো ফাটল না ধরে সে জন্যে অবশ্য নানা প্রকার সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। বিবাহের সময় খামাল একটি ডেকড়ী মুরগী ও একটি সদ্য সাবালক মোরগকে বিবাহ-স্থলে এক সাথে ভাত খেতে দেয়। যদি এরা এক সাথে ভাত খায়, তবে শুভ লক্ষণ। তারপর মোরগ দুটিকে মারত্মকভাবে মাথায় আঘাত করে পাশাপাশি ছেড়ে দেয়। লম্ফ-ঝম্ফ করে এ'দুটো প্রাণীর মৃত্যু যদি পাশাপাশি এক সাথে হয়, তবে তার ইংগিত দাম্পত্য জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের হবে। তখন আনন্দ-উৎসব শুরু হয় ও খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়ে যায়। দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার জন্যে যে সব বাস্তব পন্থা অবলম্বন করা হয়, তার প্রধানটি হলো গারো যুবতীকে রন্ধন-কার্যে বিশেষ পটু হতে হয় যাতে সুস্বাদু খাবার দ্বারা স্বামীকে বশে রাখা যায়। প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে পুরুষদের নিকট সুস্বাদু খাবারের চেয়ে বেশী কি আর হতে পারে। গারোদের প্রচীন লোকগল্পের সিংরা ও সাইমেরার বৈবাহিক ট্রাজেডীর কথা গারো যুবতীরা স্মরণ রাখে। সাইমেরা ভালো রাঁধতে পারতো না বলে উপবাসে সিংরার মৃত্যু হয়েছিলো।

ওপরে বলপূর্বক পাত্র সংগ্রহ করার যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা যে আজকাল অহরহই ঘটে তা নয়। তবে 'ওয়াংগালা' অনুষ্ঠানের তাণ্ডব নৃত্যে পাত্র-পাত্রীর দেদার মদ্য বিনিময়ের মাধ্যমে জীবন-সাথী নির্বাচন করার প্রথাটি আজও চালু আছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যুবতীটিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তা ছাড়া, স্বাভাবিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমেও বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিবাহের পর স্ত্রীর বাড়ীতে স্বামীটি ক্রমে পোষ মানা পাখীর মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠে। বস্তুতঃ সংসার পরিচালনায় ও খানিকটা কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে। কর্মঠ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক হলে কখনো কখনো স্ত্রীর ওপরও সে কর্তৃত্ব করে। ঝগড়া—বিবাদ হলে স্ত্রীকে মারধরও করে। স্ত্রী অবশ্যি দুরাচার স্বামীকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার সময় সময় হুমকি প্রদর্শন করে। তখন সাপের মাথায় ধূল পড়ার মতো স্বামীর ওপরে তা কাজ

করে। অবিশ্যি, প্রায় সব ক্ষেত্রেই এসব সাময়িক মন কষাকষি কেটে যায় এবং আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। স্ত্রীর কথায় অনেক সময় স্বামী বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তখন আবার ওকে যেতে দেয়া হয় না। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, গারো সমাজে একটি গারো যুবক একটি যুবতী ও ওর বিধবা মাকে এক সংগে বিয়ে করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মা-মেয়ের মধ্যে সতীন সুলভ কোন ঈর্ষার সৃষ্টি হয় না। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, গির্জায় পাদ্রীদের পৌনপুণিক ওয়াজ-নসিহত সত্ত্বেও তা গারোদের যৌন জীবনে তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। সামাজিক শাস্তির ভয় ছাড়া পাপ-বোধ তাদের মধ্যে আদিম কাল থেকেই জন্মোনি। গারো মেয়েরা দিগম্বর হয়ে পাহাড়ী স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করে, সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে পছন্দসই যুবক-যুবতীরা ঝোঁপ জংগলে পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ করে। সুতরাং, বিবাহক্ষেত্রে তাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় সমাজ ও সম্পত্তি, সম্পর্ক নয়। এই সম্পত্তির জন্যেই কনিষ্ঠতমা বোনের প্রতি বড়ো বোনদের প্রবল ঈর্ষা সৃষ্টি হয়। কারণ সেই সম্পত্তির মূল মালিক। বোনদের সাদী হওয়ার পর স্বামীরা যখন বাড়ীতে আসে, তখন গারো পরিবার সাধারণতঃ আর একান্নবর্তী থাকতে পারে না।

ঝোঁপ-জংগল ও টিলা কেটে পরিষ্কার ও সমতল করে ফেলার জন্যে গারোদের যে শুধু জুম চাষের অসুবিধে হচ্ছে, তা নয়, তারা শিকারের প্রাণীও পাচ্ছে না। ওয়াক, খরগোশ ইত্যাদি প্রাণী গারোদের প্রিয় খাদ্য। গারোরা দলবদ্ধ হয়ে তিন দিক ঘেরাও করে তাড়া করে খরগোশ জাতীয় প্রাণী-গুলোকে এক দিকে ধাবিত করে। ওদিকে তাক করে তীরন্দাজ বসে থাকে। খরগোশগুলো যখন লাফিয়ে বার হতে থাকে, তখন তাদেরকে এক এক করে তীর-বিদ্ধ করা হয়। একই পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ও (শূকর) শিকার করা হয়। তবে, শূকর মারার জন্যে বন্দুক ব্যবহৃত হয়। এ কাজে সাধারণতঃ বাহির থেকে শিকারী নিয়ে যাওয়া হয়। শিকারী শিকারের আনন্দে কিংবা শূকরের অত্যাচার থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফসল বাঁচাবার জন্যে সহজেই সাড়া দেয়। এ পদ্ধতিতে ভালুকা ও মধুপুর জংগলে এক এক দফা প্রচুর সংখ্যক শূকর হত্যা করা হতো। গারোরা তা দিয়ে ভোজের ব্যবস্থা করে। ভালুকায় জংগল প্রায় সাফ হয়ে যাওয়ার জন্যে সেখানে আর তেমন শূকর পাওয়া যায় না। তবে, মধুপুর জংগলে এখনও প্রচুর শূকর মিলে। এ সব কারণেই গারোরা জংগলাকীর্ণ স্থান বসবাসের জন্যে বেছে নেয়। এবং যেখানে বন উচ্ছেদ হয়, সেখান থেকেই অন্যত্র হিজরত করে। এ ভাবে বহু গারো ময়মনসিংহ-মেঘালয় সীমান্তে কিংবা সীমান্তের ওপারে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ কথাও সত্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, পাক-বাহিনীর অত্যাচারে বহু গারো সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যায়, এবং অনেকে আর ফিরে আসেনি। মেঘালয়ের অভ্যন্তরে তোরায় অবস্থানকারী গারোরা-ও পাক-বাহিনীর আক্রমণে জান-মালের দিক হতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো। এ সব নানা কারণে বাংলাদেশে গারোদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে।

গারোদের প্রধান পেশা যেমনি শ্রম সাধ্য, তেমনি বিজ্জপনকও। জংগলের অভ্যন্তরের গাছ-পালা কেটে তাদেরকে জুমচাষের ক্ষেত্র তৈরী করতে হয়। উপর্যুপরি কয়েক বৎসর এক জায়গায় জুম চাষ হয় না। তাই বারংবার তাদের স্থান পরিবর্তন করতে হয়, আর বারংবার সেই হাড় ভাংগা শ্রম। শুধু তাই নয়। হিংস্রজন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের ও মৃত্যুর আশংকা অহরহই থাকে। গারো নর-নারীরা দল বেঁধে জন্তু জানোয়ার তাড়াবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার বাদ্য ও মহিষের শিং বাজিয়ে কর্মস্থলে যায়, দিন ভর কাজ করে; তেমনি ভাবেই ফিরে। তারপর আবার আর একদল লোক শূকর-হাতীর কবল থেকে ফসল রক্ষার জন্যে রাতভর উঁচু মাচায় বসে জংগল ঘেরা জমিনেই রাত কাটায়। শূকর-হাতী ক্ষেতে পড়লে বল্লম-বর্শা, প্রজ্বলিত মশাল ইত্যাদি ছুড়ে মারে।

জুম চাষ এমনি বিপজ্জনক বলেই অদৃষ্ট ও জড়বাদী গারোরা নিজেদের ও ফসলের নিরাপত্তার জন্যে প্রতি মাসেই একাধিক তথাকথিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে এবং ভূত-প্রেত ও অপদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে ভোগ দেয়। ভোগের অংশ বিশেষ গারোরা খেয়ে ফেলে। যারা এসব অনুষ্ঠান করেনা, তাদের ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হয়, এরূপ অভিজ্ঞতার কথা গারোরা বলে থাকে। এসব উৎসব-অনুষ্ঠানে বেশুমার মদ্যপান করে গারো যুবক-যুবতীরা শিংগা ও বাদ্য বাজিয়ে উন্মাদের মতো নৃত্য করে অপদেবতাদের ভয় দেখিয়ে নিরাপত্তা বোধ করে। বলাবাহুল্য, ব্যাঘ্রকেও গারোরা অপদেবতা মনে করে যা রাতে বাঘ আর দিনে মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

জংগলের অভ্যন্তরে গারোদের বাসভবনও নিরাপদ নয়। ব্যাঘ্র-হস্তীর আক্রমণ তাদের বাসস্থলেও হতে পারে। কখনও কখনও তাদের গৃহপালিত পশু বাঘে নিয়ে যায়। এসব আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে ওরা বাঁশ কাঠ বা সুপারীর গাছ দিয়ে তৈরী উঁচু মাচানের উপর বাসস্থান নির্মাণ করে। এমন কি, বাঁশের তৈরী লম্বা সিঁড়ি দিয়ে তাদের গৃহপালিত পশুগুলোকেও মাচানের উপর তুলে ফেলে। মাচানের ঘরে বাস করায় গারোরা এতো বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, যেখানে জন্তু জানোয়ারের আশংকা নেই, সেখানেও তাদের বাড়ী-ঘর অনুরূপই। অবশ্য মাচান তৈরী করার মতো সংগতি যাদের নেই, তারা মাটির মেজেতেই থাকে।

বন জংগলের জীবন এমনি ভয়াবহ হলেও, গারোরা এ জীবনই পছন্দ করে। বনচারিণী কপালকুণ্ডলার নিকট লোকালয়-জীবন দুঃসহ ছিলো। তাই, লোকালয় ছেড়ে আবার বনেই চলে যায়। গারোদের চরিত্রও তাই।

গারোদের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে বলা হলো, তা আ'ছিক অর্থাৎ পাহাড়ী গারোদের জন্যে ষোল আনাই প্রযোজ্য। আছিক মানে পাহাড়। আছিক গারো মানে 'পাহাড়বাসী' গারো। বাংলাদেশে আছিক গারোর সংখ্যা কম। যাহোক, যারা আছিক নয়, অর্থাৎ মধুপুর, ভালুকা, দুর্গাপুর, বিড়িশিরি প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করে, তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত কম। এসব গারোদেরকে গারো ভাষায় বলে মান্দাই, মান্দি বা মান্দে। এ শব্দটির অর্থ 'মানুষ'। এর অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, মান্দে গারোরা আছিক অর্থাৎ বন্য গারোদেরকে মানুষ বলে গণ্য করতো না। চীনা ভাষায় মিন্‌হ্ মানে মানুষ। এ শব্দগুলোর উৎস সম্ভবতঃ একই। এতে করে অনুমিত হয় যে, গারোরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে চীন হতেই এতদঞ্চলে আবির্ভুত হয়েছিলো। উত্তর বঙ্গেও এক সময় প্রচুর সংখ্যক গারো ছিলো বলে জানা যায়। সিলহেটে আজও কিছু গারো আছে। বন শূন্য হওয়ার জন্যেই হয়ত ঐসব অঞ্চলের গারোরা ক্রমশঃ সরে সরে গারো পাহাড়ের নিটকবর্তী অঞ্চলে জমায়েত হয়েছিলো। যাহোক, গারোদের এতদঞ্চলে আসা সম্পর্কে দুটো অভিমত আছে। ১। গারোরা তিব্বত থেকে এসেছে। ২। গারোরা উত্তর-পশ্চিম চীন হতে এসেছে।

আমার মনে হয়, দুটো অভিমতই সত্য। অর্থাৎ পার্বত্যজাতিটি উত্তর-পশ্চিম চীন হতে তিব্বতের ভিতর দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে বাংলা ও আসামে সেঁধেছিলো। এদের মধ্যে যারা গারো পাহাড়ের পাদদেশে বসতি স্থাপন করেছিলো, তারাই গারো। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, গারোদের ভাষা চীনা-তিব্বতী ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। উত্তর পূর্ব ভারত উপমহাদেশে এ ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত আরও কয়েকটি ভাষা দেখা যায়। গারোরা যখন নিজেরা কথা বলে, তখন তাদের উচ্চারণ ও অংগভংগি দেখে মনে হয়, চীনারা চীনা ভাষায় কথা বলছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, আসাম ও বাংলাদেশে গারো ভাষার আরও ডজনখানেক উপভাষা আছে।

রামায়ণ-মহাভারতে 'কিরাত' নামে একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। শিকার তাদের পেশা ছিলো বলেই হয়ত এদেরকে 'কিরাত' বলা হতো। ফরাসী ভাষায় লিখিত গোলাম হোসায়ন সলীমের 'রিয়াজুস সালাতিন' গ্রন্থে পাওয়া যায়, বঙ্গ আসামের নরপতিগণ দুর্ধর্ষ কিরাত বাহিনী নিয়ে কৌরব পক্ষে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। আর্যেতর এই সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষতার জন্য আর্যরা বিজয়ীরূপে বহুকাল পূর্ব ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই, 'আঙুর ফল টক'—এর ন্যায় আর্যরা বংদেশ অর্থাৎ বঙ্গদেশ অপবিত্র, এদেশের মানুষ অসুর, দস্যু, পশু ইত্যাদি বিশেষণীয় উক্তি করতে থাকে। পূর্বে যে, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ এদেরকেই রামায়ণ-মহাভারতে কিরাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। গারোরাও তথাকথিত ঐ কিরাত জাতির অন্তর্ভুক্ত। সলিম হোসায়নের ফার্সী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যোগদানকারী বঙ্গ-আসামের সেনাবাহিনীর সংগে বেশ কিছু সংখ্যক চীনা সৈন্য ছিলো। সম্ভবতঃ এরাই গারো। গারোরা যে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলো, তার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট জাহাংগীর, মির্জা নাথনের নেতৃত্বে আসামে একটি বিরাট সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। মোগল সেনাবাহিনী গারো অঞ্চলে তাদের শিবির সন্নিবেশ করে বহু অর্থের বিনিময়ে সেনাবাহিনীতে পাঁচশত দুর্ধর্ষ গারো সৈন্য নিয়োগ করেছিলো। বলা বাহুল্য, এ অভিযানে বহু গারো গ্রাম ধ্বংশ হয়েছিলো এবং বহু গারো নিহতও হয়েছিলো। গারো এলাকায় একটি স্থানের নাম এখনও 'গারোমারা' নামে অভিহিত। হতে পারে, এ স্থানটিই সেই দুর্ঘটনার স্থান। গারো অঞ্চলে এরূপ অর্থবহ স্থানের নাম আরও পাওয়া যায়। বংলস্কর নামে একজন শক্তিশালী গারো খালী হাতে একটি বাঘ মেরেছিলো। তখন থেকে ঘটনাস্থলের নাম হয়েছিলো 'বাঘমারা'। স্থানটি আজও বর্তমান।

উপসংহারে উল্লেখ্য যে, গারো-সমাজে আদিম কম্যুনিষ্ট সমাজের রেশ আজও লক্ষণীয়। তাদের সম্পত্তির মালিকানা বাহ্যতঃ ব্যক্তিগত হলেও এক হিসেবে তা গোষ্ঠীগতও। এক গোত্র হতে অন্য গোত্রে যাতে মালিকানা হস্তান্তর হতে না পারে, সে জন্যেই গারো সমাজের বিবাহ-ব্যবস্থা এমন বিদঘুটে। মাতৃসমা ফুফু, মামী, শাশুড়ী ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত বিধবার সংগে যুবকের অসম বিবাহ এ কারণেই হয়ে থাকে এবং এ কারনে বহু সামাজিক সমস্যাও দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, গারোরা মাসিক অনুষ্ঠানাদিতে স্বগোত্রের বাড়ীতে ভূরিভোজন করে থাকে। এ কারণেই, গোত্রের বিত্ত রক্ষা করা তাদের একান্ত প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক বই

১. পাকিস্তানের উপজাতি, পাকিস্তান পাব্লিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৩ পৃ. ২৫—৩৬

২. জানিরা, বিরিশিরি কাল্চারাল একাডেমী, প্রথম খণ্ড, ময়মনসিংহ, ১৯৭৮

৩. ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ময়মনসিংহ জেলা কাউন্সিল, ১৯৭৮, পৃ. ৫৭২—৬০৩

৪. নাথন, মির্জা, বাহারিস্তান-ই-গায়াবি, দ্বিতীয় খণ্ড, গোহাটি, ১৯৩৬, পৃ. ৫২৮-৫২৯

৫. সলীম, গোলাম হোসায়ন, বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮১

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাংলার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭১

৭. Barch, M., The Language and Literature of Meghalaya, Simla, 1977.